তেত্রিশ বৎসরের
পুলিস কাহিনী বা
প্রিয়নাথ জীবনী

শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়

পুনশ্চ

ভূমিকা

'দাবোগার দপ্তর'-এর লেখক প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় একটি আত্মজীবনী লিখেছিলেন। তার নাম 'তেত্রিশ বৎসরের পুলিশ কাহিনী বা প্রিয়নাথ জীবনী'। গ্রন্থ শুরু হচ্ছে এভাবে, 'আমি ৩৩ বৎসর পুলিশ বিভাগে কার্য্য করিয়া ইংরাজী ১৯১১ সালের ১৬ই মে তারিখে পেন্‌সন্ লইয়া পুলিশ বিভাগ হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পর, আমার বন্ধুবান্ধবদিগের মধ্যে অনেকে আমাকে বিশেষরূপ উপরোধ করেন যে, এই দীর্ঘকাল পুলিশ বিভাগে আপনি যে সকল কার্য্য করিয়াছেন যতদূর সম্ভব সর্ব্বসাধারণের নিকট তাহা প্রকাশ করুন।' যেটুকু অংশ আমরা পড়ছি, তা হল প্রিয়নাথের জীবনের প্রথম অংশ।

বন্ধুদের অনুরোধ রক্ষার্থেই প্রিয়নাথ কলম তুলে নিয়েছিলেন। পুলিশ বিভাগে দীর্ঘকাল ধরে কাজের সুবাদে প্রিয়নাথ অনেক মোকদ্দমার সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন, অনেক সৎ ও অসৎ লোকের সঙ্গে মিশেছেন এবং ঊর্ধ্বতন ও অধস্তন কর্মচারীর সঙ্গে কাজ করেছেন। সেইসব কথা নানা কারণেই প্রকাশযোগ্য নয়। কিন্তু তিনি কি লিখতে পারেন? ও কি লেখা সম্ভব? প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় জানাচ্ছেন, 'আমার বন্ধুবান্ধবগণের মধ্যে আমার জীবনচরিত আমার নিজের মুখে শুনিতে চাহেন। তাঁহাদের অনুরোধ রক্ষা করাও আমার পক্ষে যে কতদূর অসম্ভব তাহা আমি বলিতে পারি না, কারণ আমার বিশ্বাস যে আমার জীবনের মধ্যে এরূপ কোন বিষয় নাই, যাহা দ্বারা কাহারও কোনরূপ উপকার হইতে পারে; কিন্তু বন্ধুগণের অনুরোধ রক্ষা না করিলেও চলে না, সুতরাং এই দীর্ঘকালের মধ্যে আমার জীবনে কি কি ঘটনা ঘটিয়াছে, কোন্ মকর্দ্দামা আমা কর্তৃক কিরূপে বৃত হইয়াছে, যতদূর সম্ভব তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়া এই পুস্তক 'প্রিয়নাথ জীবনী' নামে তাঁহাদিগের হস্তে প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।' এই অসাধারণ দুষ্প্রাপ্য বই 'প্রিয়নাথ জীবনী'-তে পাঠক সেই সময়ের সমাজচিত্র পাবেন একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

নিজের কথা প্রিয়নাথ তাঁর নিজস্ব বিনয়ী স্বভাবে বলতে চান নি। কিন্তু জানিয়েছেন 'দারোগার দপ্তর' লেখার নেপথ্য কারণ। প্রিয়নাথের ভাষায় পড়ি, 'দীর্ঘকাল ডিটেকটিভ্ পুলিশে কার্য্য করিয়া, যে সকল মকর্দ্দামার কিনারা করিতে সমর্থ বা সময় সময় অকৃতকার্য্য হইয়াছি তাহা আমি অনেক সময় 'দারোগার দপ্তরে' প্রকাশ করিয়া থাকি, এখন সেই সকল ডিটেক্‌টিভ্ কাহিনী পাঠকগণ এই জীবন চরিতের মধ্যেই প্রাপ্ত হইবেন, এই জীবনী পাঠে কখন কাহার যে কোনরূপ উপকার দর্শিবে না তাহা আমি বলিতে পারি না,

মফস্বলের নিরীহ পাঠকগণ এই পুস্তক পাঠ করিয়া জগতে যে কিরূপ জুয়াচুরি জাল খুন প্রভৃতি হইয়া থাকে, তাহা উত্তমরূপ জানিতে পারিবেন, ও যাহাতে তাঁহারা তাঁহাদিগের ধনপ্রাণ রক্ষা করিতে সমর্থ হন তাহারও উপায় করিতে পারিবেন।'

উপক্রমণিকার পর প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় আত্মজীবনী শুরু করেছেন 'জীবনের প্রথম অংশ' শিরোনামে। সেই অংশ থেকে আমরা জানতে পারি, সন ১২৬২ সালের ২২ শে জ্যৈষ্ঠ, ইংরাজি ১৮৫৫ খ্রিষ্টাব্দের ৪ জুন, সোমবার প্রিয়নাথের জন্ম হয়। স্থান নদিয়া জেলার দামুড়হুদা থানার অধীন জয়রামপুর গ্রামে। প্রিয়নাথ তাঁর পিতৃপুরুষের পরিচয় দিয়েছেন। জানা যায়, প্রিয়নাথের প্রপিতামহের নাম রামমোহন মুখোপাধ্যায়, পিতামহ মৃত্যুঞ্জয় মুখোপাধ্যায় এবং পিতা জয়চন্দ্র মুখোপাধ্যায়। মাতা মুক্তকেশী দেবী।

প্রিয়নাথ তাঁর পূর্বপুরুষের কথা বলেছেন। তাঁরা কিভাবে জীবিকা নির্বাহ করতেন সেকথাও জানিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, 'ঐ সময় ঐ প্রদেশে নীলকরদিগের অতিশয় প্রাদুর্ভাব ছিল, যাঁহারা নীলকুঠিতে চাকুরি করিতেন, তাঁহারাই ঐ প্রদেশে বড় চাকুরের মধ্যে পরিগণিত হইতেন।' প্রিয়নাথের পিতামহেরা চার ভাই নীলকুঠিতে ভালো ভালো কাজ করতেন। আর একজন জনার্দন মুখোপাধ্যায় করতেন স্বাধীন ব্যবসা।

প্রিয়নাথের পিতামহেরা যে অতিশয় সাহসী ছিলেন সে প্রসঙ্গে গ্রন্থকার দুই পিতামহের জীবনে ঘটা একটি দুঃসাহসিক ঘটনার বিবরণ লিখেছেন। অতীব দুঃসাহসে ভর করে দুই ভাই কীভাবে বাঘকে ধরে এনেছিল তা পড়তে খুবই ভালো লাগে। এই ঘটনা থেকে জানা যায়, মুখোপাধ্যায় পরিবারের মধ্যে অকুতোভয় মানসিকতাটা কেমন দৃঢ়ভাবে হৃদয়ে বাস করত।

পিতামাতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রিয়নাথ স্পষ্টতই লেখেন, 'পিতা কখন পরের নিকট চাকুরি করিয়া জীবনধারণ করেন নাই। তিনি নিতান্ত স্বাধীন প্রকৃতির লোক ছিলেন। নিতান্ত শৈশব হইতে সংসারের ভার তাঁহার স্কন্ধে পতিত হইলেও তিনি কখন কাহারও নিকট অধীনতা স্বীকার করেন নাই। সামান্য স্বাধীন ব্যবসা অবলম্বন করিয়া তিনি দিনপাত করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহারও সাহস ও মনের বল অতিশয় প্রবল ছিল, এবং পরের পদানত ও আজ্ঞানুবর্তী হইয়া কিরূপে চলিতে হয় তাহা তিনি জানিতেন না।' মায়ের সম্পর্কে সুন্দর ব্যাখ্যা করেন। 'মাতা মুক্তকেশী দেবীও ঠিক সেই প্রকৃতির ছিলেন। অনশনে দিন অতিবাহিত করিতে হইলেও কখন তাঁহারা কাহারও নিকট সাহায্য গ্রহণ করিতেন না।' পিতামহ প্রয়াত হলে পিতার অবস্থা অতি শোচনীয় হয়ে ওঠে। যেদিন থেকে প্রিয়নাথের মা সংসারে পদার্পণ করেন, সেদিন থেকেই পিতার অবস্থার পরিবর্তন শুরু হয়। সামান্য কৃষিকাজ দিয়ে জীবনজীবিকা শুরু করলেও তিনি একজন প্রধান ব্যবসাদারে পরিণত হন। পিতা তারপর চাল, কাপড়, তেজারতি ব্যবসায় নিজেকে ব্যস্ত রাখেন। এমন দিন আসে তিনি অনেক লোককে প্রতিপালনও করতে থাকেন। প্রিয়নাথের ব্যক্তিগত অনুভূতি, 'তাঁহার বিষয় আশয় বা সংগতি কিছুই ছিল না, কিন্তু কথার অতিশয় ঠিক ছিল, মুখ দিয়া তিনি যাহা বাহির করিতেন, সহস্ররূপে প্রতিবন্ধক প্রাপ্ত হইলেও তিনি তাহা করিতেন।'

প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর জীবন-কথায় পিতার সংগ্রাম, সাহস, সত্যনিষ্ঠতার পরিচয় দিয়েছেন। মাতা ও পিতার আকস্মিক মৃত্যুর পর প্রিয়নাথের জীবন কোন পথে যায় তা জানার জন্য আমাদের 'প্রিয়নাথ জীবনী' পড়তে হবে। লিখছেন, 'আমার বাল্যকাল হইতেই একটু সাহস ও কতকটা গোঁয়ারতুমি বুদ্ধি ছিল, পিতামাতা আমার সেই সাহসকে দমন করিবার চেষ্টা না করিয়া বরং প্রশ্রয়ই দিতেন।'

এই যে সাহস, যা আমরা মুখোপাধ্যায় পরিবারের পূর্ব পুরুষের হৃদয়ে সঞ্চিত দেখেছি, তা ক্রমশ রক্তের ধারাপথে প্রিয়নাথেও প্রবাহিত।

নিজের পড়াশুনা নিয়ে জানাচ্ছেন, 'আমি নিতান্ত সামান্য অধ্যয়ন করিতাম সত্য কিন্তু বৎসর বৎসর উচ্চশ্রেণীতে উঠিতে পারিতাম। সময়মত ক্রমে প্রথম শ্রেণীতে উঠিলাম ও ঐ স্কুলের শিক্ষা শেষ করিয়া মাইনর স্কলার্সিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ঐ স্কুল পরিত্যাগপূর্ব্বক কৃষ্ণনগর কলেজে আসিয়া ভর্ত্তি হইলাম।' কৃষ্ণনগর কলেজে আগত সাহেব মেমের সঙ্গে ছাত্ররা যে আচরণ করেছিল তা সত্যিই মজার এবং অবশ্যই দণ্ডনীয় অপরাধ ছিল। যদিও কলেজের প্রিন্সিপালের কাছে নালিশ হয়েছিল, পুলিশও অনুসন্ধান করেছিল, কোনও ছাত্রকেই শনাক্ত করা যায়নি এবং কাউকেই দণ্ড পেতে হয়নি।

'নীলদর্পণ' নাটকে দীনবন্ধু মিত্র নীলকর সাহেবের অত্যাচার ও নীলচাষীদের দুর্দশার চিত্র অঙ্কন করেছেন। প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর জীবনীতে দ্বাদশ পরিচ্ছেদে ১৮৫৯-৬০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ যে ভয়নক নীলবিদ্রোহ হয়েছিল তা তিনি বালক বয়েসে শুনেছেন বলে স্বীকার করেছেন। এক জায়গায় লিখছেন, 'আমরা যে সময় জন্মগ্রহণ করি, সেই সময় নীলকরগণের ভীষণ অত্যাচারের উপর গভর্ণমেন্টের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল, ও সেই সকল প্রবল অত্যাচার ক্রমেই কমিয়া আসিতেছিল।' আবার লিখছেন, 'সেই সময় আমাদিগের দেশে নীলকরদের প্রায় শেষ অবস্থা হইয়া আসিয়াছিল।'

প্রিয়নাথের জীবনী থেকে জানা যায়, 'এ দেশে পূর্ব্বে যে সকল নীলকর সাহেব নীলের চাষ করিতেন, তাহার মধ্যে সকলেই যে অতিশয় অত্যাচারী ও প্রজাপীড়ক ছিলেন তাহা নহে; তাঁহাদিগের মধ্যে অনেক সদাশয় ও মহানুভব ব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যাইত; কিন্তু অত্যাচারীর সংখ্যাই অধিক ছিল।' প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় এই জীবনীতে নীলকর ইতিবৃত্তের দুই-একটি ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেন। পাঠক 'প্রিয়নাথ জীবনী'-তে সাধারণ মানুষের দুর্দশার ছবি দেখতে পাবেন। প্রজারা জানত নীলকররাই দেশের রাজা। তাঁদের আজ্ঞা প্রতিপালন না করলে তাঁদের বিপদের আর সীমা নেই। এই বিপদের মাত্রাকে গ্রন্থকার চিত্রিত করেছেন। নীলকরদের বিচার পদ্ধতি এত প্রাঞ্জলভাবে প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় ছাড়া আর কে লিখেছেন!

প্রিয় পাঠক, প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় হলেন 'দারোগার দপ্তর'-এর স্রষ্টা। তার নেপথ্যে যে লেখালেখির সূচনা সেখানে দেখা যাচ্ছে কৃষ্ণনগর কলেজে ছাত্র থাকাকালীন তিনি গদ্য, প্রবন্ধ, পদ্য লিখতেন। প্রিয়নাথের ভাষ্য, 'যে সময় আমি কৃষ্ণনগর কলেজে অধ্যয়ন করিতাম তাহার পূর্ব্ব হইতেই আমার লিখিবার একটু সখ ছিল। সময় সময় দুই একটী পদ্য লিখিতাম ও পদ্যতে কখন কখন প্রবন্ধাদি লিখিতাম।' কৃষ্ণনগরে একটি ক্লাবের সভ্যরূপে মাঝে মাঝে প্রবন্ধ লিখে নানা সাহিত্যসভায় পাঠ করতেন। যদিও সেই সকল প্রবন্ধ, পদ্য কোথাও প্রকাশ পেত না। প্রিয়নাথ জানাচ্ছেন, 'বাস্তবিক সেই সকল বাল্যরচনা মুদ্রিত হইবার উপযুক্তও হইত না। ক্রমে নষ্ট হইয়াই যাইত।' বোঝা যাচ্ছে, এই ছাত্রাবস্থাতেই প্রিয়নাথের লেখালেখির সূচনা। যার পরিণত ফসল আমরা পাই 'দারোগার দপ্তর'-এর মূল্যবান পৃষ্ঠায়।

পিতার মৃত্যুর পর প্রিয়নাথ যে কী ভয়ানক সংগ্রাম করেন, কীভাবে সংসার চালান, পিতার কারবারকে কেমন অবস্থায় রাখতে সক্ষম হন, অকপট বলে গেছেন গ্রন্থকার। তারপর পিতার পছন্দের পাত্রীকে বিবাহ। ১২৮০ সালের মাঘ মাসের শুরুতেই শ্রীমতী মানদাসুন্দরী দেবীর সঙ্গে প্রিয়নাথের বিবাহ হয়। যদিও তখন প্রিয়নাথের পিতা পরলোকে চলে গেছেন।

বিবাহের পর স্ত্রীভাগ্যে কি পরিবার আশার, সুখের দিন দেখল? নাকি একইরকম চলতে থাকল? সন্তানের জন্ম হল। প্রিয়নাথের প্রথম পুত্র প্রমথনাথের জন্মে অতিশয় আনন্দ হলেও অর্থাভাবে মনের কোনও সাধই সে সময় মেটানো গেল না। লিখছেন, 'এমনকি সেই সময় স্ত্রী পুত্র প্রতিপালন করা আমার পক্ষে নিতান্ত কষ্টকর হইয়া পড়িল।'

এতই কষ্টকর হয়ে উঠল প্রিয়নাথ তাঁর স্ত্রী-পুত্রকে শ্বশুরবাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। পরিবারে অর্থকষ্ট এমন দাঁড়াল যে পিসি জানাল এখন যেটুকুও অন্ন সংস্থান হল, রাতে আর কোনও উপায় নেই। অশ্রু ব্যতীত তখন আর কি অবলম্বন থাকতে পারে?

প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় এবার স্থির করেন 'কলিকাতায় গমন করিয়া কোন সামান্য কার্য্য উপলক্ষ্য করিয়াও আমি আমার এই সামান্য পরিবার প্রতিপালন করিব' —অথচ জীবন তো অন্য ধারায় এগোয়। কলকাতায় গেলেন বটে, কিন্তু প্রাপ্তিযোগ তেমন হল না। হাতে রোজগার হল না। জীবনের পথ ফুলে ঢাকা রইল না। এই বই সেই সংগ্রামের ইতিহাস।

'দারোগার দপ্তর'-এর স্রষ্টা প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের আত্মজীবনী 'তেত্রিশ বৎসরের পুলিস কাহিনী বা প্রিয়নাথ জীবনী' নতুনভাবে আত্মপ্রকাশ করছে পুনশ্চ প্রকাশনার সৌজন্যে। পুনশ্চের কর্ণধার আমার বন্ধু সন্দীপ নায়ক এই বই ছাপার দুঃসাহস দেখিয়েছেন। তাঁকে ধন্যবাদ। বাংলা সাহিত্যের উজ্জ্বল ইতিহাসে এই বই উজ্জ্বল উদ্ধার রূপে গণ্য হবে এ বিশ্বাস রাখি।

রথযাত্রা ১৪২৮

অরুণ মুখোপাধ্যায়
চন্দননগর, হুগলি

তেত্রিশ বৎসরের পুলিস কাহিনী বা প্রিয়নাথ জীবনী

উপক্রমণিকা

আমি ৩৩ বৎসর পুলিস বিভাগে কার্য্য করিয়া ইংরাজী ১৯১১ সালের ১৬ই মে তারিখে পেন্‌সন্ লইয়া পুলিস বিভাগ হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পর, আমার বন্ধুবান্ধবদিগের মধ্যে অনেকে আমাকে বিশেষরূপ উপযোগ করেন যে, এই দীর্ঘকাল পুলিস বিভাগে আপনি যে সকল কার্য্য করিয়াছেন যতদূর সম্ভব সর্ব্বসাধারণের নিকট তাহা প্রকাশ করুন। বন্ধুগণের অনুরোধ রক্ষা করা যে কতদূর দুরূহ ব্যাপার তাহা পাঠকগণ সহজে অনুমান করিতে পারেন কি? পুলিস বিভাগে এই দীর্ঘকাল নিযুক্ত থাকায় আমাকে যে কত মোকদ্দমার অনুসন্ধানে নিযুক্ত হইতে হইয়াছিল, কত সৎ ও অসৎ লোকের সহিত সদা সর্ব্বদা মিলিত হইতে হইয়াছিল, কত ঊর্দ্ধতন ও অধস্তন কর্ম্মচারীর সহিত একত্র কর্ম্মক্ষেত্রে বিচরণ করিতে হইয়াছিল, তাহার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ প্রকাশ করা নিতান্ত সহজ নহে। প্রথমতঃ সকল ঘটনা আমার মনে নাই, দ্বিতীয়তঃ যতদূর মনে আছে তাহা প্রকাশ করিতে হইলে আমাকে যে নানারূপ বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে হইবে সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই, কারণ যে সকল ব্যক্তির মধ্যে নানারূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাঁহারা সৎ হউন বা অসৎ হউন, ধনী হউন বা নির্ধন হউন, তাঁহাদিগের দোষ গুণের কথা আমাকে নিঃস্বার্থ ভাবে আলোচনা করিতে হইবে। তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা এখনও বর্ত্তমান আছেন, বা যাঁহাদের বংশধরগণ এখন সমাজের মধ্যে মনুষ্য বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাদিগের পূর্ব্ব-পুরুষগণের দুষ্ক্রিয়া সকল সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রকাশিত হইতে দেখিয়া কখনোই চুপ করিয়া থাকিবেন না। তৃতীয়তঃ আমার ঊর্দ্ধতন বা অধস্তন কর্ম্মচারিগণের সহিত সময় সময় আমার যে সকল কারণে মনোমালিন্য ঘটিয়াছে, তাঁহাদিগের যে সকল কার্য্য আমি কিছুতেই অনুমোদন করিতে পারি নাই, সেই সকল বিষয় এখন আমাকে প্রকাশ করিতে হইবে। ওই সকল কর্ম্মচারীর মধ্যে অনেকেই এখনও জীবিত, তাঁহারা তাঁহাদিগের সেই সকল চিত্র সম্মুখে দেখিতে পাইলে আমাকে বিশেষ রূপে বিপদ্‌গ্রস্ত করিবার যে চেষ্টা করিবেন তাহাতেও আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

এই সমস্ত বিষয় পরিত্যাগ করিয়া যদি লিখিতে প্রবৃত্ত হই তাহা হইলে আমার কোনরূপ বিপদের সম্ভাবনা নাই সত্য, কিন্তু ওরূপ ভাবে লেখনী হস্তে সর্ব্বসাধারণের নিকট দণ্ডায়মান হওয়া অপেক্ষা ওই লেখনী দূরে নিক্ষেপ করাই যুক্তি সংগত।

আমার বন্ধু বান্ধবগণের মধ্যে অনেকে আমার জীবন চরিত আমার নিজের মুখে শুনিতে চাহেন। তাঁহাদের অনুরোধ রক্ষা করাও আমার পক্ষে যে কতদূর অসম্ভব তাহা আমি বলিতে পারি না, কারণ আমার বিশ্বাস যে আমার জীবনের মধ্যে এরূপ কোন বিষয় নাই, যাহা দ্বারা কাহারও কোনরূপ উপকার হইতে পারে; কিন্তু বন্ধুগণের অনুরোধ রক্ষা না করিলেও চলে না, সুতরাং এই দীর্ঘকালের মধ্যে আমার জীবনে কি কি ঘটনা ঘটিয়াছে, কোন্ মোকদ্দমা আমাকর্ত্তৃক কিরূপে ধৃত হইয়াছে, যতদূর সম্ভব তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়া এই পুস্তক 'প্রিয়নাথ জীবনী' নামে তাঁহাদিগের হস্তে প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। দীর্ঘকাল ডিটেক্‌টিভ পুলিসে কার্য্য করিয়া, যে সকল মোকদ্দমার কিনারা করিতে সমর্থ বা সময় সময় অকৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহা আমি অনেক সময় 'দারোগার দপ্তরে' প্রকাশ করিয়া থাকি, এখন সেই সকল ডিটেক্‌টিভ কাহিনী পাঠকগণ এই জীবন চরিতের মধ্যেই প্রাপ্ত হইবেন, এই জীবনী পাঠে কখনও কাহারও যে কোনরূপ উপকার দর্শিবে না তাহা

আমি বলিতে পারি না, মফঃস্বলের নিরীহ পাঠকগণ এই পুস্তক পাঠ করিয়া জগতে যে কিরূপ চুরি জুয়াচুরি জাল খুন প্রভৃতি হইয়া থাকে, তাহা উত্তমরূপ জানিতে পারিবেন, ও যাহাতে তাঁহারা তাঁহাদিগের ধন প্রাণ রক্ষা করিতে সমর্থ হন তাহারও উপায় করিতে পারিবেন।

অনেক সময় কাহারও জীবন চরিত কোন কোন পাঠকের সুখ পাঠ্য হয় না, কিন্তু আমার বিশ্বাস পুলিস বিভাগে আমার ৩৩ বৎসর কার্য্য করিবার কালীন যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে তাহা পাঠকগণের নিকট যে একেবারে নীরস পাঠ্য হইবে, তাহা মনে করি না, কিন্তু আমার পূর্ব্ব বা বাল্য ঘটনা যে পাঠকগণের প্রতিজনক হইবে তাহা নহে, সুতরাং সেই সমস্ত ঘটনা যত সংক্ষেপে পারি শেষ করিয়া দিব। মনে করিয়াছিলাম, যে দিবস হইতে আমি পুলিস বিভাগে প্রবেশ করিয়াছিলাম সেই দিন হইতেই আমার কাহিনী আরম্ভ করিব, কিন্তু কার্য্যে তাহা করিয়া উঠিতে পারিলাম না, কারণ ইহাতে জীবনী-গ্রন্থের অঙ্গহানি হয়।

জীবনের প্রথম অংশ

সন ১২৬২ সালের ২২শে জ্যৈষ্ঠ অথবা ইংরাজী ১৮৫৫ সালের ৪ জুন সোমবার বেলা ৮ দণ্ড ২৩পল বা ৯টা ৫০ মিনিটের সময়, চতুর্থী তিথি, উত্তরাষাড়া নক্ষত্র, কর্কটলগ্ন ও মকর রাশিতে, নদীয়া জেলার অন্তর্গত, দামুড়হুদা থানার অধীন, জয়রামপুর নামক গ্রামে আমার জন্ম হয়।

আমার পিতা-মাতা কে, কিরূপে আমার পূর্ব্ব পুরুষগণ এই গ্রামে তাঁহাদিগের বাসস্থান স্থাপিত করেন, তাঁহারা কোন বংশসম্ভূত, তাহার কিছু সংক্ষেপে পরিচয় আমার বিবেচনায় এই স্থানে দেওয়া কর্ত্তব্য।

আমার বৃদ্ধ প্রপিতামহের পর্য্যন্ত বাসস্থান ছিল নদীয়া জেলার মধ্যে প্রসিদ্ধ শান্তিপুর গ্রামে। ওই স্থান বল্লভীমেলের আকর স্থল। তিনি বল্লভীমেলের দুর্গাধর পণ্ডিতের সন্তান, কুলীন ও একজন পণ্ডিত ছিলেন। প্রপিতামহ ৺রামমোহন মুখোপাধ্যায় জয়রামপুর গ্রামে শুদ্ধ শ্রোত্রীয় মৌলিক বংশে বিবাহ করিয়া সেই গ্রামেই নিজের বাসস্থান স্থাপিত করেন। তাঁহার পাঁচ পুত্র ৺রাধানাথ মুখোপাধ্যায়, ৺জনার্দ্দন মুখোপাধ্যায় ৺মৃত্যুঞ্জয় মুখোপাধ্যায়, ৺ধনঞ্জয় মুখোপাধ্যায়, ও ৺শর্ব্বচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ৺মৃত্যুঞ্জয় মুখোপাধ্যায় আমার পিতামহ। তাঁহার দুই পুত্র ৺জয়চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও ৺রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। আমার পিতা ৺জয়চন্দ্র মুখোপাধ্যায়। আমার মাতা ৺মুক্তকেশী দেবী। ইনি ২৪পরগণা জেলার অন্তর্গত স্বাশন নামক স্থানের নিকটবর্ত্তী দাদপুর নামক একখানি ক্ষুদ্র পল্লির ৺দ্বারিকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা। আমার প্রপিতামহ ৺রামমোহন মুখোপাধ্যায় যখন তাঁহার পঞ্চ পুত্রের সহিত জয়রামপুরে বাস করিতেন, সেই সময় বিশেষরূপ মান সম্ভ্রমের সহিত গ্রামের মধ্যে তাঁহার অতিশয় প্রতিপত্তি ছিল, তিনি অতিশয় সাহসী ও পরাক্রমশালী পুরুষ ছিলেন। তাঁহার পুত্রগুলিও তাঁহা অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন ছিলেন না। প্রপিতামহ মহাশয় কোন কর্ম্ম কার্য্য করিতেন না, পুত্রগণের উপার্জ্জন হইতেই তিনি জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া, কেবল গ্রামের পাঁচজনের কার্য্যেই সময় অতিবাহিত করিতেন।

ওই সময় ওই প্রদেশে নীলকরদিগের অতিশয় প্রাদুর্ভাব ছিল, যাঁহারা নীলকুঠিতে চাকুরি করিতেন, তাঁহারাই ওই প্রদেশে বড় চাকুরের মধ্যে পরিগণিত হইতেন। আমার পিতামহেরা চারি ভাই নীলকুঠিতে ভাল ভাল কার্য্য করিতেন, কেবল জনার্দ্দন মুখোপাধ্যায় স্বাধীন ব্যবসার উপর নির্ভর করিয়াছিলেন।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে আমার পিতামহগণ অতিশয় সাহসী ছিলেন, তাঁহাদিগের দুই ভ্রাতার এক দিবসের একটি দৃষ্টান্ত এই স্থানে প্রদত্ত হইল। ইহাতেই পাঠকগণ তাঁহাদিগের পরাক্রমের কথঞ্চিৎ আভাস প্রাপ্ত হইবেন।

আমার জন্মস্থান জয়রামপুর গ্রামে অতিশয় ব্যাঘ্র ভয় ছিল, তাহা এখনও সময় সময়ও হইয়া থাকে। ৺শারদীয়া পূজার সময় পূজা উপলক্ষে পিতামহগণ বাড়িতে আসিয়া সম্মিলিত হইতেন। এক বৎসর সন্ধ্যার সময় আমার পিতামহ মৃত্যুঞ্জয় মুখোপাধ্যায় ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শর্ব্বচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বাহিরের ঘরে

বসিয়া গল্প-গুজব করিতেছিলেন, এমন সময় তাঁহাদিগের গরুর রাখাল আসিয়া সংবাদ প্রদান করিল যে, সন্ধ্যার পূর্ব্বে যখন সে মাঠ হইতে গরু লইয়া গৃহাভিমুখে আগমন করিতেছিল, সেই সময় একটি ব্যাঘ্র নিকটবর্ত্তী জঙ্গল হইতে বহির্গত হইয়া একটি গরুর বৎসকে লইয়া গিয়াছে। পাঠকগণকে বোধ হয় বলিতে হইবে না, পল্লিগ্রামের একটু বর্দ্ধিষ্ণু গৃহস্থ মাত্রেরই অনেকগুলি করিয়া গরু থাকিত; কাহারও দুইজন, কাহারও বা চারিজন করিয়া গোরক্ষক নিযুক্ত থাকিত। উহারা ওই সমস্ত গরু মাঠে লইয়া গিয়া চরাইত। গোচারণের মাঠ গ্রামের মধ্যে অনেক রক্ষিত থাকিত ইহা আমিও বাল্যকালে গ্রামে বাস করিবার কালীন দেখিয়াছি, কিন্তু আজ-কাল চাষির সংখ্যা বাড়িয়া যাওয়ায় পতিত জমী আর প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না।

গোরক্ষক ওই সংবাদ প্রদান করিবামাত্র তাঁহারা উভয়েই গাত্রোত্থান করিলেন, ও তাহাকে কহিলেন, যে ব্যাঘ্র আমাদিগের গোবৎস লইয়া গিয়া হত্যা করিয়াছে তাহার সহজে নিষ্কৃতি নাই। চল কোন্ জঙ্গল হইতে ওই ব্যাঘ্র বাহির হইয়াছিল ও কোন্ জঙ্গলের মধ্যে গোবৎস লইয়া প্রবেশ করিয়াছে তাহা আমাদিগকে দেখাইয়া দেও। এই বলিয়া দুই ভাই দুই গাছি বংশ-যষ্টি হস্তে লইয়া সেই গোরক্ষকের সহিত গমন করিলেন। গোরক্ষক তাঁহাদিগের উভয়কেই লইয়া গিয়া যে স্থানে ব্যাঘ্র গোবৎস আক্রমণ করিয়া যে জঙ্গলের মধ্যে লইয়া যায়, তাহা দেখাইয়া দিল। ওই স্থানের অবস্থা দেখিয়া দুই ভ্রাতা, তাঁহাদিগের কেবলমাত্র সম্বল সেই বংশ-যষ্টি হস্তে সেই জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ করিলেন। কিছুদূর গমন করিয়াই দেখিতে পাইলেন দুইটি ব্যাঘ্র এক স্থানে তাঁহাদিগের সেই গোবৎসকে ভক্ষণ করিতেছে, ইহা দেখিয়াই, এক একজন একটি একটি ব্যাঘ্রকে আক্রমণ করিলেন ও তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া জীবিত অবস্থাতেই উভয় ব্যাঘ্রকে ধরিয়া, আপন আপন স্কন্ধের উপর স্থাপিত করিয়া গ্রামের মধ্যস্থিত তাঁহাদিগের বাসস্থানের নিকটবর্ত্তী বারয়ারি তলায় উপস্থিত হইলেন।

তাঁহাদিগের বাটীর নিকট একটি স্থানে বারয়ারি পূজা হইত। সেই স্থানে একটি বৃহৎ বকুলবৃক্ষ ছিল। ওই বকুলবৃক্ষ তলে পাড়ার সমস্ত লোকের বসিবার স্থান ছিল। পল্লিগ্রামের পাঠকগণ অবগত আছেন যে প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই এইরূপ একটি না একটি স্থান আছে, যে স্থানে পাড়ার বা গ্রামের অধিকাংশ লোক সকালে ও বৈকালে সম্মিলিত হইয়া নানারূপ গল্প গুজব করিয়া সময় অতিবাহিত করিয়া থাকেন। আমাদিগের গ্রামে ওই বকুল তলায় সেইরূপ সকলে উপবেশন করিতেন। তাঁহারা যখন ব্যাঘ্রদ্বয়কে লইয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন, তখন পাড়ার অনেকেই সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা এই অবস্থা দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন, কিন্তু সেই সময় ব্যাঘ্রদ্বয়কে কোথায় রাখা যাইবে তাহার কিছুমাত্র স্থির করিতে না পারিয়া ওই স্থানের নিকটবর্ত্তী একটি পাকা বাটীর একখানি খালি ঘরের ভিতর উহাদিগকে বদ্ধ করিয়া রাখিলেন। পর দিবস প্রাতঃকালেই ওই বকুলবৃক্ষ তলায় তাহাদিগের থাকিবার মত একটি ছোট পাকা ঘর প্রস্তুত করা হইল ও সেই ঘরের ভিতর ওই ব্যাঘ্রদ্বয়কে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়া, তাহাদিগের আহারের নিমিত্ত বিশেষ বন্দোবস্তও করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ওই স্থানে ওই ব্যাঘ্রদ্বয় কয়েক বৎসর অবস্থিতি করিয়া পরিশেষে একে একে কাল গ্রাসে পতিত হয়। যতদিবস পর্য্যন্ত ওই ব্যাঘ্রদ্বয় ওই স্থানে আবদ্ধ ছিল ততদিবস পর্য্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন দূরবর্ত্তী স্থান হইতে বিস্তর লোক আসিয়া ওই ব্যাঘ্রদ্বয়কে দেখিয়া যাইত।

যে বকুলবৃক্ষ তলে ওই ব্যাঘ্রদ্বয়কে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল, সেই বৃক্ষ আমি বাল্যকালে দেখিয়াছি কিন্তু এখন ওই স্থানে ওই বৃক্ষের অস্তিত্ব নাই।

এই ব্যাঘ্র ঘটিত কথা শুনিয়া অনেকেই উহা অতিরঞ্জিত বলিয়া মনে করিতে পারেন কিন্তু পাড়ার যে সকল লোক সেই সময় বর্ত্তমান ছিলেন, ও যাহাদিগের সম্মুখে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যে চারি-পাঁচজন সম্ভ্রান্তশালী ব্যক্তিকে আমি জীবিত অবস্থায় দেখিয়াছি ও তাঁহাদিগের মুখে এই সমস্ত কথা শুনিয়াছি। তাঁহাদিগের মধ্যে একজন আজ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান আছেন, কিন্তু অতিশয় বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন।